উপকূলীয় অঞ্চল নীতি

২০০৫

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচী

১। ভূমিকা ---------- ১

১.১ উপকূলীয় প্রতিবেশ ---------- ১

১.২ বিদ্যমান নীতিমালা ---------- ১

১.৩ যৌক্তিকতা ---------- ১

২। ঘোষণা ---------- ২

৩। উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ---------- ২

৩.১ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র ---------- ২

৩.২ সমন্বিত ব্যবস্থাপনা উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নের চাবিকাঠি ---------- ২

৩.৩ লক্ষ্য ---------- ৩

৪। নীতিমালা ---------- ৩

৪.১ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ---------- ৩

৪.২ মৌলিক চাহিদা ও জীবিকায়নের সুযোগ ---------- ৩

৪.৩ ঝুঁকি কমানো ---------- ৪

৪.৪ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ---------- ৫

৪.৫ সুষম বণ্টন ---------- ৬

৪.৬ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ---------- ৭

৪.৭ নারী উন্নয়ন ও নারী-পুরুষ সমতা ---------- ৭

৪.৮ সংকটাপন্ন প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ---------- ৭

৫। অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ ---------- ৯

৫.১ উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনাকে জাতীয় মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ ---------- ৯

৫.২ কৌশলগত পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন ---------- ৯

৫.৩ বাস্তবায়ন ---------- ১০

৫.৪ সমন্বয় ---------- ১০

৫.৫ সহায়ক কার্যাবলী ---------- ১১

৫.৬ আইনগত কাঠামো ---------- ১২

১. ভূমিকা

১.১ উপকূলীয় প্রতিবেশ

বাংলাদেশের মোট আয়তন ১৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃ মিঃ এবং ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা সমন্বয়ে গঠিত পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নদীমালা বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। বঙ্গোপসাগর বরাবর উপকূলীয় তটরেখার দৈর্ঘ্য ৭১০ কিঃ মিঃ।

সংকট ও সম্ভাবনাময় এলাকা হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল। এখানে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বেশি। এছাড়া প্রাকৃতিক ও মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগসমূহ যেমন নদী ভাঙ্গন, ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক, জলাবদ্ধতা, ভূমিকম্প, পানি ও মাটিতে লবণাক্ততা, নানা রকমের দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ইত্যাদির সম্মিলিত প্রভাবের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের জীবন ও জীবিকার ধারা যেমন বাধাগ্রস্ত হয়েছে তেমনি এ অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিও হয়েছে মন্থর।

দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন সম্ভাবনা আছে যা বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অর্থবহ অবদান রাখতে পারে। উপকূলীয় মাছ ও চিংড়ি, বন, লবণ এবং খনিজদ্রব্যসহ বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সম্পদের সমাহার এই অঞ্চলে বিদ্যমান। এখানে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর, স্থলবন্দর এবং পর্যটন ও অন্যান্য শিল্পের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এছাড়া বেলাভূমি ও সমুদ্রবক্ষে প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণের সম্ভাবনাও বিশাল। এসব সম্পদের অনেক কিছুই এখন পর্যন্ত অনাহরিত এবং এগুলোর অনেক অংশ ব্যবহারের সুযোগ ও সম্প্রসারণ করার অবকাশ রয়েছে ।

এ ছাড়াও উপকূলে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষণযোগ্য কিছু প্রতিবেশ বা ইকোসিস্টেম আছে। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ সুন্দরবনের অংশবিশেষকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান' হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে সেন্টমার্টিন দ্বীপে রয়েছে প্রবাল প্রতিবেশ । উপকূলীয় অঞ্চল শুধু জীববৈচিত্র্যের এক বিশাল আধারই নয় বরং এই এলাকা একটি সার্বজনীন সম্পদের পরিবেশগত ভিত্তি। এই সম্পদের এক বিরাট অংশ হলো বঙ্গোপসাগরের রকমারি মৎস্য ভান্ডার ।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, সীমিত সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতা, প্রকৃতি ও মানুষের বৈরীতার কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়, অর্থনৈতিক সুযোগের অপ্রতুলতা, গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত আধার ইত্যাদি কারণে সমন্বিত উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী । এই উপলব্ধি থেকেই সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা, কৌশল (দারিদ্র্য হ্রাসের জাতীয় কৌশলসহ) এবং বিভিন্ন পরিকল্পনায় উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নের বিষয়গুলো বারংবার উপস্থাপিত হয়েছে ।

১.২ বিদ্যমান নীতিমালা

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সময়ে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পাদনের লক্ষ্যে নিজস্ব নীতিমালা ঘোষণা করেছে। মন্ত্রণালয়সমূহ তাদের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে এবং এই নীতিগুলোর[১] সাথে উপকূলীয় বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

১.৩ যৌক্তিকতা

সরকার প্রধানত তিনটি কারণে উপকূলীয় অঞ্চল নীতির যৌক্তিকতা বিবেচনা করছে :

ক. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উপকূলীয় অঞ্চল নানাভাবে পিছিয়ে আছে;

খ. বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় অনগ্রসরতা ও পরিবেশের ক্রমাবনতি;

গ. জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার প্রচুর সম্ভাবনা উপকূলীয় অঞ্চলে বিদ্যমান।

---

১ পরিবেশ নীতি (১৯৯২) ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম (১৯৯২), জাতীয় বন নীতি (১৯৯৪), পশু সম্পদ উন্নয়ন নীতি (১৯৯২), জাতীয় মৎস্য নীতি (১৯৯৮), জাতীয় পর্যটন নীতি (১৯৯২), জাতীয় জ্বালানী নীতি (১৯৯৬), নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন নীতি (১৯৯৮), জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি (২০০১), জাতীয় শিক্ষা নীতি (১৯৯৭), জাতীয় শিশু নীতি (১৯৯৪), নারী উন্নয়নের জন্য জাতীয় নীতি (১৯৯৮), জাতীয় পানি নীতি (১৯৯৯), জাতীয় কৃষি নীতি (১৯৯৯), শিল্প নীতি (১৯৯৯), জাতীয় নৌ নীতি (২০০০), জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি (২০০১), জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি (২০০০)

২. ঘোষণা

উপকূলীয় অঞ্চল দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে বিভিন্নভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সকলের অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে উপকূলীয় সম্পদ ব্যবহারে দ্বন্দ্ব নিরসন এবং বিভিন্ন সুযোগের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা রচিত হয়েছে। যা সংশ্লিষ্ট সবাইকে উপকূলীয় অঞ্চলের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সাধারণ দিক-নির্দেশনা দেবে। এর ফলে উপকূলীয় জনগণ একটি নিরাপদ ও অনুকূল পরিবেশে তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি খাত-কেন্দ্রিক পরিধির উর্ধ্বে বিভিন্ন খাতের নীতিমালার একটি সমন্বিত রূপ। এই নীতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার উপকূলীয় অঞ্চলে নিজ নিজ কর্মসূচী বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমন্বয়ের একটি শক্তিশালী প্রক্রিয়ার সূচনা করবে।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি পর্যাবৃত্তে হালনাগাদ এবং প্রয়োজন বোধে সংশোধন করা হবে।

৩. উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা

৩.১ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র

বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক সীমা নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে : জোয়ার-ভাটার প্রভাব, লোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস। এদের "কোন না কোনটির" প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বলয়ে রয়েছে ১৯টি জেলা[২]।

এ জেলাগুলোর সবকটি উপজেলা/ থানাকে উপকূল অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এদের মধ্যে সাগর পাড়ের ৪৮টি উপজেলা/থানা নানান প্রাকৃতিক কারণে ঝুঁকিপূর্ণ। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলকে (EEZ) উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যে ধরা হয়েছে।

দেশের স্থলভাগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকা নিয়ে উপকূলীয় অঞ্চল গঠিত। ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ৩ কোটি ৪৮ লাখ।

৩.২ সমন্বিত ব্যবস্থাপনা উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নের চাবিকাঠি

উপকূলীয় অঞ্চল নীতির আলোকে সরকার সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার (ICZM) সদিচ্ছা ব্যক্ত করছে। এই নীতি অনুসরণ করে সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা, ব্যক্তিখাত ও সুশীল সমাজ উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নে সচেষ্ট হবে।

সম্পদের পরস্পরবিরোধী ব্যবহার এবং পরিবেশ বিনষ্টকারী অপরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের বিরূপ প্রভাবের কথা বিবেচনায় রেখে নীতি নির্ধারণ ও কর্মকৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন।

উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার প্রধান দিকগুলো হচ্ছে:

ক. সামঞ্জস্য বিধান ও সমন্বয় সাধন;
খ. একটি প্রক্রিয়া হিসেবে চালু করা;
গ. জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সংযোগ;
ঘ. নিজ নিজ সংস্থার (লাইন এজেন্সির) মাধ্যমে বাস্তবায়ন;
ঙ. যৌথ ব্যবস্থাপনা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত;
চ. নারী-পুরুষ সমতা;
ছ. অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
জ. বিকেন্দ্রিকরণ ও ব্যক্তিখাতের উন্নয়নের জাতীয় নীতিকে সমর্থন দান;

২ জেলাগুলো হচ্ছে বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, গোপালগঞ্জ, যশোহর, ঝালকাঠি, খুলনা, লক্ষ্মীপুর, নড়াইল, নোয়াখালি, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা, শরীয়তপুর ও পটুয়াখালী।

ঝ. জানামতে সবচেয়ে ভাল ও গ্রহণযোগ্য জ্ঞানের ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ, জ্ঞানের ঘাটতি পুরণের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা গ্রহণ;
ঞ. উপকূলীয় অঞ্চলের বিষয়গুলোর উপর অগ্রাধিকার নির্ধারণ।

৩.৩ লক্ষ্য

উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দায়িত্বশীল মৎস্য ব্যবস্থাপনা, ম্যানগ্রোভ ব্যবস্থাপনার জন্য আচরণ বিধি এবং মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (Millennium Development Goal)-সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হচ্ছেঃ দারিদ্র্য হ্রাস, টেকসই জীবিকার উন্নয়ন এবং জাতীয় মূলধারার সাথে উপকূলীয় অঞ্চলের সম্পৃক্ততার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরী করা।

৪. নীতিমালা

বিভিন্ন উন্নয়ন লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ঘোষণা করছে। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে কী ভাবে নিরাপদে ও টেকসই পদ্ধতিতে জীবনধারণ করতে পারে, নীতিমালায় এসব বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

৪.১ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমুন্নত রেখে দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এই সম্পর্কিত নীতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. দারিদ্র্য হ্রাস ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

খ. উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাপ্ত সুযোগের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সাগরের মাছ, লবণ চাষ, চিংড়ি চাষ, কাঁকড়া চাষ, ঝিনুক চাষ, মুক্তা চাষ, গবাদি পশু উন্নয়ন, এলাকাভিত্তিক কৃষি উন্নয়ন ও কৃষিভিত্তিক শিল্প, পরিবহন, জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ-ভাঙ্গা, পর্যটন, সমুদ্র সৈকতের খনিজ আহরণ, নবায়নযোগ্য বা অনবায়নযোগ্য শক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে বিদ্যমান সুযোগ কাজে লাগানো;

গ. দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক ধরণ চিহ্নিত করে কর্মকৌশল ঠিক করা। (১) শ্রমনির্ভর ক্ষুদ্র প্রযুক্তির বিনিয়োগে গুরুত্ব দেয়া যেন দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষেরা কাজের সংস্থান পেতে পারে (২) এছাড়া সেসব শিল্প গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা যেখানে উপকূলীয় অঞ্চলে মানবসৃষ্ট সম্পদকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়;

ঘ. উপকূলীয় অঞ্চলে, বিশেষ করে দ্বীপসমূহে বিদ্যুৎ, যাতায়াত ও টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান;

ঙ. গ্যাসভিত্তিক শক্তি উৎপাদন ও শিল্প কারখানা নির্মাণে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান;

চ. বসতিপূর্ণ বিচ্ছিন্ন চর ও দ্বীপগুলোকে 'বিশেষ গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচীর' আওতায় আনা;

ছ. উপকূলীয় অঞ্চলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিশেষ করে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ যেন বৃদ্ধি পায় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া এবং এ অঞ্চলে আরো রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নেয়া;

জ. কক্সবাজার, নিঝুম দ্বীপ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ও কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত এবং সুন্দরবনকে পর্যটকদের কাছে আকৃষ্ট করার জন্য আরো উন্নত করা এবং এসব স্থান ও দ্বীপকে "বিশেষ পর্যটন এলাকা" হিসেবে গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা;

ঝ. উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি মাপের বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪.২ মৌলিক চাহিদা ও জীবিকায়নের সুযোগ

২০০২ সালে টেকসই উন্নয়নের জন্য বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে (WSSD)[৩] পাঁচটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এগুলো হচ্ছেঃ - পানি সরবরাহ ও পয়ঃব্যবস্থা, শক্তি, স্বাস্থ্য, কৃষি ও জীববৈচিত্র্য (WEHAB)[৪]। বাংলাদেশের উপকূলীয়

৩ World Summit on Sustainable Development
৪ Water, Energy, Health, Agriculture and Bio-diversity.

অঞ্চলে এসব মৌলিক চাহিদার অধিকাংশই পূরণ হচ্ছে না। উপকূলীয় জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও জীবিকায়নের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের নীতি হচ্ছে :

ক. দারিদ্র্য হ্রাসের উপায় হিসেবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাই হবে সকল অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য। আয় বাড়ানোর জন্য স্থানীয় সম্পদভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি করা;

খ. প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা গ্রহণের উপর ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেয়া;

গ. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও তা বজায় রেখে রপ্তানিযোগ্য বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া;

ঘ. ব্যক্তিখাত ও বিভিন্ন এনজিওকে দরিদ্র মানুষের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে উৎসাহিত করা;

ঙ. জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জামানত ছাড়া সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা;

চ. বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণের আগে পুরোনো জীবিকার পথ যাতে বন্ধ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা;

ছ. আপদকালীন সময়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

জ. ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বণ্টনের ব্যবস্থা করা এবং জমি বণ্টন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা;

ঝ. ভূমি পুনরুদ্ধারের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ঞ. উপকূলীয় অঞ্চলে নৌ-চলাচলের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা ঃ

   ১. সমুদ্র বন্দরের এবং অভ্যন্তরীণ প্রধান নদীপথগুলোর (channel) উন্নতি সাধন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;
   ২. দুটো সমুদবন্দরের উন্নতি সাধন এবং নদীবন্দর, ঘাট, অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার বন্দর ও ডিপোগুলোর মধ্যে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা;
   ৩. গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া;
   ৪. যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে দ্বীপসমূহের মধ্যে উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা;
   ৫. নৌযানে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
   ৬. নৌপথগুলোকে সংরক্ষণ করা;
   ৭. নদীগুলোর নাব্যতা বজায় রাখার জন্য নদী খনন কাজের ক্ষমতা বাড়ানো;

ট. জনপথ, প্রধান প্রধান সড়ক, গ্রামীণ সড়ক, রেলপথ এবং নৌপথসহ একটি সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

ঠ. আইন শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে বিচ্ছিন্ন এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা;

ড. জনগণের জন্য অবাধ তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৪.৩ ঝুঁকি কমানো

মানুষের জীবনযাত্রার মানের সাথে কিছু বাহ্যিক বিষয়ের (Exogenous phenomena) সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। অনেক বিত্তহীন পরিবার যাদের উপার্জন প্রকৃতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, ঘূর্ণিঝড়, জলাবদ্ধতা, নদী ভাঙ্গন বা খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের অনেক ক্ষতি করে। প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস পাওয়ার কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার অবনতি হচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষিকাজই অধিকাংশ মানুষের পেশা, যা মূলতঃ ঋতুভিত্তিক। এদেশে অধিকাংশ পরিবারের জীবনযাত্রা জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ। জীবনযাত্রার এই ঝুঁকি নিরসনকল্পে সরকারের নীতি নিম্নরূপ :

ক. দারিদ্র্য হ্রাসের জাতীয় কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাসের উপর গুরুত্ব দেয়া;

খ. উপকূলীয় অঞ্চলকে বিবেচনায় এনে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার (Comprehensive Disaster Management Plan) সাথে সমন্বয় সাধন করা;

গ. দুর্যোগকালে দরিদ্রদের দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষমতা বাড়ানোর কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা ও তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য বীমা পদ্ধতি চালু করা;

ঘ. নদী ভাঙ্গন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং নদী ভাঙ্গা মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

ঙ. দুর্যোগকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, বহুমুখী ব্যবহার-উপযোগী বাঁধ, কিল্লা, রাস্তা-ঘাট ও দুর্যোগ সতর্কীকরণ ব্যবস্থার সমন্বয় করা। এক্ষেত্রে শিশু, মহিলা, প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

চ. জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলার প্রাথমিক কার্যক্রম হিসেবে উপকূলীয় বাঁধগুলোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী বনায়ন করা;

ছ. ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনা জোরদার করা এবং ভূমিকম্প মোকাবেলার ক্ষমতা বাড়ানো;

জ. দুর্যোগ ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে গবাদি পশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

ঝ. উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা। এক্ষেত্রে যথাযথ সামাজিক বনায়নসহ অন্যান্য পদ্ধতিতে বৃক্ষরোপণ, পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেয়া;

ঞ. বিত্তহীন মানুষ বিশেষ করে নারীদের সম্পদের ওপর মালিকানা বা অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের ঝুঁকি মোকাবেলার ক্ষমতা বাড়ানো।

৪.৪ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা

উপকূলীয় অঞ্চল অনেক প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। মিঠা ও লোনা পানির মাছ ও চিংড়ি, ম্যানগ্রোভ ও অন্যান্য বনভূমি, জমি, গবাদি পশু, লবণ, খনিজ সম্পদ, নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস, যেমনঃ জোয়ার-ভাটা, বায়ু প্রবাহ এবং সৌরশক্তি এসবই হচ্ছে উল্লেখযোগ্য উপকূলীয় সম্পদ। জৈব ও অজৈব সব ধরনের উপকূলীয় সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকার যেসব স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী নীতি গ্রহণ করেছে সেগুলো হচ্ছে :

ক. উপকূলীয় অঞ্চল ও বঙ্গোপসাগরে মিলিত সকল নদীর প্রয়োজনীয় পানি প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তজার্তিক নদী সমূহ হতে প্রাপ্ত পানির ন্যায্য অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

খ. নবায়নযোগ্য সম্পদের টেকসই ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ লক্ষ্যে সম্পদের আহরণ, উত্তোলন অথবা ব্যবহারের উপর বিধিমালা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা;

গ. উপকূলীয় সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা। উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি, বনায়ন ও মৎস্য চাষের সম্মিলিত ও যৌথ কর্মকাণ্ড যেন টেকসই হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া;

ঘ. সম্পদের বহুমুখী ব্যবহারে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;

ঙ. বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে সংরক্ষণের বিধি-বিধানসমূহের প্রয়োগের মাধ্যমে সংরক্ষণ নীতির বাস্তবায়ন করা;

চ. সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৪.৪.১ জমি

ক. জমির অপরিকল্পিত ও যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসেবে ভূমি ব্যবহার নীতির অধীনে পরিকল্পনা গ্রহণ করা, জেগে উঠা নতুন চরের ভূমি ব্যবহারের কর্মকৌশল তৈরি করা এবং যথাসময়ে এলাকাভিত্তিক ভূমি ব্যবহার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

খ. দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার মাধ্যমে সমুদ্র ও নদী থেকে ভারসাম্যপূর্ণ ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

৪.৪.২ পানি

ক. সমুদ্র হতে আসা পানিতে মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্যে যে হুমকির সৃষ্টি হয়েছে, তা মোকাবেলার জন্য উজান থেকে পানির প্রবাহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া;

খ. উপকূলীয় অঞ্চলে সেচ সুবিধার জন্য ক্ষুদ্রাকার পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যা জোয়ারের পানিকে কাজে লাগাতে পারবে। বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে পোল্ডারের মধ্যে যথাযথ পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যাতে করে মিঠা পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়;

গ. বৃষ্টির পানি আহরণ ও সংরক্ষণকে উৎসাহিত করা;

ঘ. পানি সংরক্ষণের জন্য দীঘি ও পুকুর খনন করা এবং পানি শোধনের স্থানীয় প্রযুক্তি (যেমনঃ পি.এস.এফ) ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা;

ঙ. ভূ-গর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া।

৪.৪.৩ প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদ

ক. জাতীয় মৎস্য নীতি অনুসারে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়ন করা;

খ. উন্মুক্ত জলাশয়ে জেলেদের অধিকার রক্ষার মাধ্যমে টেকসই এবং দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

৪.৪.৪ মৎস্য চাষ

ক. পরিবেশবান্ধব ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য চিংড়ি চাষকে উৎসাহিত করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করা;

খ. উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য চাষের সকল সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো। কাঁকড়া চাষ, মুক্তা চাষ, সামুদ্রিক শৈবালকে উৎসাহিত করা।

৪.৪.৫ কৃষি

ক. পুরুষ ও নারী চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষিকাজ জোরদার করা এবং শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচী হাতে নেয়া;

খ. মাটির গুণাগুণ বজায় রেখে উপকূলীয় এলাকায় চাষযোগ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা;

গ. রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সার ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার প্রচলনকে উৎসাহিত করা;

ঘ. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এমন প্রজাতির শস্য উদ্ভাবন এবং লবণাক্ততা রোধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ঙ. সেচ সুবিধার আওতাগুলি পরীক্ষা করা এবং / অথবা প্রসারিত করা এবং সব ধরনের কৃষিকাজে একটি সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা।

৪.৪.৬ পশু পালন

ক. গবাদি পশুর জন্য চারণভূমির বন্দোবস্ত করা। গবাদি পশু উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো;

খ. স্থানীয় প্রজাতিসহ অন্যান্য প্রজাতির হাঁস-মুরগি পালনের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৪.৪.৭ বনায়ন

ক. উপকূলীয় অঞ্চলসহ নতুন জেগে ওঠা চর বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় আনা;

খ. বন সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ. সামাজিক বনায়ন উৎসাহিত করা এবং এর পরিধি বাড়ানো।

৪.৪.৮ শক্তি

ক. শক্তির সম্ভাবনাময় উৎস হিসেবে সমুদ্রের জোয়ার ও ঢেউ ব্যবহার করার সম্ভাবনা যাচাই করা;

খ. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিয়মিত / সার্বক্ষনিক ভিত্তিতে সকল শক্তির উৎস (যেমনঃ তেল, গ্যাস, কয়লা, আণবিক খনিজ, পানি, জৈব জ্বালানি, সৌরশক্তি, বায়ু, জোয়ার-ভাটার তরঙ্গ) প্রকৃতিকে বিপন্ন না করে যাচাই করা। সমুদ্রতীর হতে দূরবর্তী অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম সম্পদের অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

গ. এলাকাভিত্তিক নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলোর সম্ভাবনা যাচাই করা;

ঘ. দ্বীপসহ দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন এলাকা যা অদূরভবিষ্যতে বাণিজ্যিকভাবে শক্তি সরবরাহের আওতায় আনা সম্ভব হবে না, সেখানে ব্যয়বহুল হলেও নবায়নযোগ্য শক্তির প্রযুক্তি স্থাপনের সম্ভাবনা বিবেচনা করা। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে সৌরশক্তি ব্যবহার করা;

ঙ. দ্বীপগুলোতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মতো বিশেষ কিছু প্রকল্প চিহ্নিত করা। বিচ্ছিন্ন এলাকা ও দ্বীপগুলোতে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য পৃথক পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৪.৫ সুষম বন্টন

বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা গরিব মানুষদের বিভিন্ন সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখে। একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পদ সকলের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে সক্ষম হলেও নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে গরিব মানুষ সেখানে পৌঁছুতে পারে না। অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নীতি হচ্ছে :

ক. দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের (ঘূর্ণিঝড়প্রবণ উপকূলীয় অঞ্চল, চর ও নদীভাঙ্গনে আক্রান্ত এলাকা) দরিদ্র মানুষ, যারা পরিবেশগত ঝুঁকির শিকার হতে পারে, তাদের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা এবং সুযোগ বঞ্চিতদেরকে গুরুত্ব দেয়া;

খ. সাগর পারের উপজেলা ও দ্বীপগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক সুবিধার সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা;

গ. সকলের সমঅধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর জোর দেয়া। এক্ষেত্রে গরিব মানুষদের ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থানভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও সামাজিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া;

ঘ. দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত লোকেরা যেন প্রাকৃতিক সম্পদ (যার উপর তাদের জীবিকা নির্ভরশীল) ব্যবহারে বেশি সুবিধা পেতে পারে, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

৪.৬ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন

উপকূলীয় জনগণের নিরাপত্তা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে সরকারের নীতি হচ্ছে:

ক. সমতার ভিত্তিতে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ স্থানীয় সরকার কাঠামোর সাথে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা;

খ. অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা;

গ. উপকূলীয় জনগোষ্ঠী যেমনঃ লবণাক্ত অঞ্চলের কৃষক, সমুদ্রগামী জেলে, লবণ চাষী, শুটকি তৈরির কাজে নিয়োজিত মানুষ, বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের শ্রমিক, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী প্রমুখ, যেসব ক্ষেত্রে ঝুঁকির সম্মুখীন, সেখানে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া;

ঘ. স্থানীয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতা প্রদান করা;

ঙ. সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার দীর্ঘমেয়াদী উপকারিতা, উপকূলীয় এলাকায় সাম্প্রতিক উন্নয়ন কার্যক্রম এবং উপকূলীয় উন্নয়ন কর্মকৌশল সম্পর্কে বেসরকারি সংস্থা, ব্যক্তিখাত, সুশীল সমাজ ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা;

চ. উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া।

৪.৭ নারী উন্নয়ন ও নারী-পুরুষ সমতা

উপকূলীয় এলাকায় জীবিকা ও সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য লক্ষণীয়। উপকূলীয় অঞ্চলের মেয়েরা জাতীয় গড়ের দ্বিগুণেরও বেশি পুষ্টিহীনতার শিকার। নিরাপদ পানির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে পানি সংগ্রহের কাজে মহিলাদের অনেক কষ্ট করতে হয়। ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতা হচ্ছে আরেকটি সমস্যা যা মহিলাদের অংশগ্রহণকে সীমিত করে ফেলছে। উপকূলীয় এলাকায় এই সমস্যাটি আরো গুরুতর। অনুকূল সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি করে মহিলাদের কাজের ক্ষেত্রে সকল বাধা অপসারণ করা আবশ্যক।

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরকার নারীদের অবস্থার উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করার উপর সুস্পষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। নারী ও শিশু অধিকার রক্ষায় সরকার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এক্ষেত্রে সরকারের নীতি নিম্নরূপ:

ক. নারী-পুরুষ সমতা বিষয়ে একটি সংবেদনশীল এবং অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রচলন করা যা নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস করবে এবং যা সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রয়োজন ও স্বার্থকে সংরক্ষণ করবে;

খ. নারীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করা এবং নারীদের ঝুঁকি মোকাবেলার ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করা;

গ. নারীদের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদানসহ নারীদের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সুযোগ লাভের যাবতীয় বাঁধা দূর করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া;

ঘ. খাস জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া;

ঙ. নারীদের জীবিকায়নের জন্য ও সুবিধা বঞ্চিত নারীদের ক্ষমতায়নে বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;

চ. নারী নির্যাতন রোধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণসহ প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.৮ সংকটাপন্ন প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলে স্বীকৃত উপকূলীয় অঞ্চলের জল ও স্থলভূমির সব ধরনের প্রতিবেশ (ম্যানগ্রোভ, কোরাল রীফ, উন্মুক্ত জলাশয়, সামুদ্রিক ঘাসের বাগান (Sea grass beds), মধ্যবর্তী দ্বীপ (Barrier island), মোহনা ও বদ্ধ জলাশয়-এর সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশেষ অঞ্চল হিসেবে ঘোষিত এলাকাগুলোর[৫] জন্য প্রণীত সকল আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

এক্ষেত্রে সরকারের নীতি হলো ঃ

৪.৮.১ প্রতিবেশ সংরক্ষণ

ক. পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা, জীববৈচিত্র্যে ঐতিহ্যমণ্ডিত এলাকা ও সামুদ্রিক সম্পদের আধারসহ অন্যান্য নাজুক অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

খ. সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ. চলমান প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সুদৃঢ় করা, পরিবেশ অধিদপ্তরের সামর্থ্য, ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ানো এবং পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন নীতির বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো তৈরি করা;

ঘ. কোস্ট গার্ড-এর ভূমিকাকে গুরুত্ব দেয়া এবং তাদের সামর্থ্য, ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ানো যাতে তারা সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হয়ে আইন প্রয়োগ করতে পারে;

ঙ. যেসব কর্মকাণ্ডের ফলে জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে, তা বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া এবং জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া;

চ. সকল আন্তর্জাতিক সমঝোতার প্রতি সম্মান রেখে পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

ছ. উপকূলীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদ রক্ষার্থে চলমান আইনের পাশাপাশি সামঞ্জস্য রেখে নতুন বিধি বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা;

জ. গাছ-গাছালির প্রজাতি, বন্যপ্রাণী ও পাখি রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া;

ঝ. পাহাড় কাটা বন্ধ এবং পাহাড় ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.৮.২ দূষণ রোধ

ক. বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ ও বিধি মোতাবেক বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ সহ নতুন শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা;

খ. সকল শিল্প ক্ষেত্রে দূষণ বন্ধের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের সময়সীমা নির্ধারণ করা। এক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক মহল থেকে অর্থ সংগ্রহ করবে। যে সকল শিল্পোদ্যোক্তা পরিবেশবান্ধব বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না, তাদের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার যাবতীয় ব্যয় বহন করার প্রয়োজনে "গ্রীন ট্যাক্স" চালু করা;

গ. চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশালের মতো বড় শহরে পয়ঃশোধন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। অন্যান্য ছোট শহরেও পর্যায়ক্রমে অনুরূপ কার্যক্রম হাতে নেয়া;

ঘ. আন্তর্জাতিক কনভেনশন স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে জাহাজ নির্গত বর্জ্য ও তেল দূষণ প্রশ্নে আন্তর্জাতিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করা;

ঙ. জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের গ্রহণযোগ্যতা পুনর্বিবেচনা করা এবং এই শিল্প যদি চালু থাকে, তাহলে এ সংক্রান্ত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবেশের মান রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.৮.৩ জলবায়ু পরিবর্তন

ক. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনকে পর্যবেক্ষণ করা অব্যাহত থাকবে। এছাড়া এ ব্যাপারে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, সঠিক তথ্য নিরূপণ, আরো সঠিক ও দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাস দেয়া এবং জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বাড়াতে পদক্ষেপ নেয়া;

খ. উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত পরিস্থিতি মোকাবেলার পদক্ষেপ ক্রমান্বয়ে কার্যকরী করা;

গ. সমুদ্রে পানির উচ্চতা বৃদ্ধির প্রাথমিক প্রতিরোধ হিসেবে উপকূলীয় বাঁধের সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা;

ঘ. সমুদ্রে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ও এর আনুষাঙ্গিক প্রভাব নিরূপণে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা এবং তা মোকাবেলা করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া।

---

৫ সংরক্ষিত বনভূমি, বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রম, বিশ্ব ঐতিহ্যমণ্ডিত এলাকা, সামুদ্রিক অভয়াশ্রম, জাতীয় উদ্যান, প্রতিবেশ উদ্যান, শিকার সংরক্ষণ, সংকটাপন্ন প্রতিবেশ এলাকা, রামসার এলাকা ইত্যাদি।

৫. অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ

উপকূলীয় অঞ্চলে সকল ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর রূপরেখা প্রণয়ন এবং তৎসংশ্লিষ্ট আইন ও বিধান জারী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫.১ উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনাকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনাকে (ICZM) সন্তোষজনকভাবে উন্নয়নের মূলধারার সাথে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পূর্বশর্ত হিসেবে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে :

ক. জাতীয় কর্মকৌশল দলিল (যেমনঃ PRSP) এবং বিভিন্ন মেয়াদী ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া;

খ. উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নীতির কাঠামো গ্রহণ করা;

গ. বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মতৈক্যের ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের পরিধি ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা।

উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য একটি সমন্বিত সাধারণ নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতি ও কৌশলের মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যক। মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ICZM-কে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার কৌশল হিসেবে বিবেচিত হবে।

এই নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় তার সদিচ্ছা ব্যক্ত করছে, যার ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত হবে। এ সংক্রান্ত সরকারের নীতি হলোঃ

ক. সকল জাতীয় কৌশল, মেয়াদী ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা;

খ. জাতীয় কৌশল নির্ধারণী দলিলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল (Coastal Development Strategy, CDS) প্রণয়ন ও গ্রহণযোগ্য করা;

গ. উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার কাজটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক পালন করা;

ঘ. ভবিষ্যতে সকল নীতি ও কৌশলপত্রে (Strategic Document) উপকূলীয় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে বর্তমানের নীতিগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা;

ঙ. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP)-তে মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত তহবিলে উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নে বরাদ্দকৃত তহবিল-এর বিশেষ উল্লেখ থাকবে। সেই সাথে এই বরাদ্দ যেন ধীরে ধীরে বাড়ানো যায় সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসরণ করে মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করাই হবে ব্যবস্থাপনার প্রথম পদক্ষেপ, যেখানে সরকার ও জনগোষ্ঠী দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেবে। এটা স্থানীয় ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডের অধিকতর উপযোগী পদ্ধতি বলে বিবেচিত হবে।

৫.২ কৌশলগত পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন

দারিদ্র্য হ্রাস, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের জন্যে একটি **উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল** (CDS) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে ।

এই কৌশল, সময় ও সম্পদের ভিত্তিতে উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নে আশু পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত করবে। কিন্তু তা কোন মহাপরিকল্পনা তৈরি করবে না বরং একটি নীতিমালা বাস্তবায়নের পদ্ধতি উপস্থাপন করবে। এ ধরনের কৌশলে কিছু দৃঢ় সিদ্ধান্তও নিতে হবে। যেমনঃ কোন বিশেষ এলাকা, কোন সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণী এবং কোন নির্দিষ্ট বিষয় বাস্তবায়নে গুরুত্ব আরোপ করা হবে। সেই সাথে কাজের মান ও অগ্রগতি নির্ণয়ের জন্য কিছু সূচক নির্ধারণ এবং পরিবীক্ষণের বন্দোবস্ত করা হবে।

কৌশলপত্রে উপকূলীয় উন্নয়নের বিশেষ দিক নিয়ে আলোকপাত করা হবে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসের জাতীয় কৌশল, মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অন্যান্য জাতীয় নীতি ও কর্মপরিকল্পনার সাথে সংযোগ রক্ষা করা হবে।

কৌশলপত্রটিকে একটি ধারাক্রমের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারেঃ নীতি --> কৌশল --> অগ্রাধিকারভিত্তিক বিনিয়োগ কার্যক্রম।

কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ কর্মসূচী প্রণয়ন সংক্রান্ত নীতি হলো:

ক. আলোচনার মাধ্যমে একটি উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল (CDS) তৈরি করা এবং তা ICZM-এর দলিল হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক সমর্থিত হওয়া;

খ. উপকারভোগী কর্তৃক CDS-এর মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য সকল প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

গ. উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ), এনজিও, ব্যক্তিখাত, সুশীল সমাজ এবং গণসংগঠন প্রভৃতি সম্পৃক্ত হবে এবং মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে সমর্থন দেবে;

ঘ. সর্বোপরি সমন্বয়ের একটি কার্যকর পদ্ধতির আত্মীকরণ এবং বাস্তবায়নের একটি সাধারণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করাই হবে লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে CDS সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধাসমূহ চিহ্নিত করবে।

৫.৩ বাস্তবায়ন

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার হাতে ন্যস্ত থাকবে। উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সরকারের নীতি হলো :

ক. একটি অগ্রাধিকারভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচী, উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়ন কৌশল (CDS) - এর কার্যকরী অংশ হিসেবে গণ্য হবে এবং তা ICZM প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে;

খ. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা বিভিন্ন খাতকে সম্পৃক্ত করে বিদ্যমান বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্টতা তৈরি করা হবে ;

গ. বাস্তবায়ন পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের জন্য মূল সংস্থায় (WARPO) একটি কর্মসূচী সমন্বয় ইউনিট (Program Co-ordination Unit-PCU) প্রতিষ্ঠা করা হবে। ICZM-এর নির্ধারিত সূচকের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি দেখাশোনা করা এর প্রধান দায়িত্ব;

ঘ. সংস্থাগুলো স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে তাদের কর্মকর্তাদের CDS-এর কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করবে এবং তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে;

ঙ. গণসংগঠনগুলো স্থানীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে স্থানীয় সরকারের সাথে যোগসূত্র রক্ষা করবে যাতে করে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সাথে তাদের সমন্বয় ঘটে।

৫.৪ সমন্বয়

ICZM একটি বহু স্তর ও বহু খাতভিত্তিক কার্যক্রম হওয়ার কারণে এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর মাঝে সমন্বয়ের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। এই কার্যক্রমের অপর একটি লক্ষ্য হলো ICZM-এর নীতিমালা ও অনুশীলনকে উপকূলীয় সকল সংস্থার কর্মকাণ্ড পরিচালন পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করা।

এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে মূল মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থাকে মূল সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আন্তঃমন্ত্রণালয়ের টেকনিক্যাল কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটি মূল মন্ত্রণালয়/সংস্থায় সমন্বয়ের কাজে সহযোগিতা করবে। এ বিষয়ে যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, তা নিম্নরূপ ঃ

ক. মূল মন্ত্রণালয়ের (Lead Ministry) জাতীয় কাউন্সিল ICZM কর্মকাণ্ডে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, বিশেষ করে উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নে এবং গোটা ICZM প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান করবে;

খ. উপকূলীয় অঞ্চল সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হবে। এই উচ্চ পর্যায়ের কমিটির প্রধান হবেন মূল মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এ কমিটির সদস্য হবেন। মূল মন্ত্রণালয় এই কমিটির সচিবালয় হিসেবে কাজ করবে;

গ. মূল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবকে প্রধান করে আন্তঃমন্ত্রণালয় টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হবে। সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার প্রতিনিধিগণ এই কমিটির সদস্য থাকবেন। এই কমিটি নীতি বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং সেই

সাথে আন্তঃসংস্থা দ্বন্দ্ব সমাধান করবে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও ও ব্যক্তিখাত এর প্রতিনিধিগণ এই কমিটির সদস্য থাকবেন। মূল সংস্থা এই কমিটির সচিবালয় হিসেবে কাজ করবে;

ঘ. ICZM প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কর্মসূচী সমন্বয় ইউনিট (Program Co-ordination Unit - PCU) বিভিন্ন সার্ভিস মন্ত্রণালয়, যেমন অর্থ, পরিকল্পনা ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে;

ঙ. সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় Focal Point স্থাপন করা হবে, যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে ICZM কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এবং PCU-এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করবেন;

চ. স্থানীয় পর্যায়ে (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত স্থানীয় সরকার কাঠামোকে কাজে লাগানো হবে। স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে সমর্থন দেয়া হবে এবং জাতীয় পর্যায়ে PCU ও খাতভিত্তিক সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা হবে;

ছ. প্রাথমিক পর্যায়ে অস্থায়ীভাবে স্থাপিত প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস (PDO) কতগুলো নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন এবং ICZMকে একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে দেখাশোনা করবে।

৫.৫ সহায়ক কার্যাবলী

অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সহায়ক কার্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

৫.৫.১ উপকূলীয় সম্পদ জরীপঃ এটি মূলতঃ উপকুলীয় অঞ্চলের জৈব-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত যা উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর উপর প্রকৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ করে। এসকল জৈব-প্রাকৃতিক বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে - জৈব সম্পদ, প্রধান-প্রধান জীব-বসতি ও প্রতিবেশ, পুনঃউৎপাদন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রসমূহ, (নার্সারি এবং সংকটাপন্ন ও দুস্প্রাপ্য প্রজাতি)। অন্যান্য সম্পদের মধ্যে রয়েছে নদী, মাটি, বন, সমুদ্র, পানি, বায়ু, খনিজদ্রব্য ইত্যাদি।

৫.৫.২ উপকূলীয় সম্পদের তথ্য ভাণ্ডার তৈরি ঃ উপকূলীয় সম্পদের একটি সমন্বিত তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা;

৫.৫.৩ মডেলিং প্রযুক্তি ঃ ICZM-এর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য গণিতিক ও ভৌত মডেলিং, উপগ্রহের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিবিম্ব ও জি.আই.এস. প্রযুক্তি চালু রাখা;

৫.৫.৪ তথ্য প্রচার ঃ জনসাধারণকে ICZM কার্যক্রম, উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, CDS এবং অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার জন্য একটি পরিপূর্ণ তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া;

৫.৫.৫ সামর্থ্য, ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ানো ঃ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ICZM-এর আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সামর্থ্য, ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ানো।

এক্ষেত্রে সরকারের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী নীতি হলোঃ

ক. উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য একটি বেসলাইন তথ্য বিবরণী তৈরি করা যা সময়ে-সময়ে বিভিন্ন সংস্থার অংশগ্রহণে আরো সমৃদ্ধ হবে। অনুরূপভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জেলা তথ্য বিবরণী তৈরি করা;

খ. সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদের তথ্য ভাণ্ডার তৈরিতে সমর্থন দেয়া এবং অন্যান্য তথ্য ভাণ্ডারের সাথে এর সংযোগ স্থাপনসহ একটি গ্রহণযোগ্য নীতিমালা তৈরি করা, যা সাধারণ মান, নিয়ম-কানুন ও উপাত্ত আদান-প্রদানের পদ্ধতি নির্দেশ করবে;

গ. বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন নীতির পর্যালোচনা করে তথ্যের অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে নতুন আইন তৈরি করতে হবে যা তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার নিয়মকে সহজতর ও গ্রহণযোগ্য করবে;

ঘ. মডেলিং, উপগ্রহের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিবিম্ব সংগ্রহ এবং জি.আই.এস প্রযুক্তি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানকে অব্যাহত সমর্থন দেয়া;

ঙ. ICZM-এর আলোকে উপকূলীয় হাইড্রোডিনামিক মডেলিংকে আরো সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে সমর্থন দেয়া। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রকৃত ধারণার জন্য কিছু এলাকায় ফিজিক্যাল মডেলিং পদ্ধতি ব্যবহার করা;

চ. উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশলে ও অন্যান্য খাতের পরিকল্পনায় একটি শক্তিশালী জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম তৈরি করার ওপর জোর দেয়া। সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে আলোচনা করে গবেষণা কাজের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্র চিহ্নিত করা;

ছ. সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে ICZM-এর কার্যক্রম ও উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশলের যৌক্তিকতা ও উপকারিতা বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার দায়িত্ব নেয়া। এছাড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৫.৬ আইনগত কাঠামো

উপকূলীয় অঞ্চল নীতিতে উপযুক্ত আইনগত কাঠামো বিন্যাস সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। উপকূলীয় এলাকায় পর্যবেক্ষণ ও পাহারা, প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা এবং উপকূলীয় সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে অনেক আইন প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশের সকল আইন-কানুন উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য।

উপকূলীয় অঞ্চলের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে প্রচলিত আইনের ব্যবহার ও বিস্তার প্রয়োজন। উপকূলীয় অঞ্চল নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনে প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান ইত্যাদির সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হবে। উপকূলীয় অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছ ও কার্যকর আইনের কাঠামো নির্ধারণে নিম্নোক্ত নীতি গ্রহণ করা হবে ঃ

ক. উপকূলীয় অঞ্চল সম্পর্কিত প্রচলিত আইনের তালিকা প্রণয়ন করা হবে। এই তালিকা তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে - (১) বিভিন্ন আইনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অসামঞ্জস্যতা, ঘাটতি ও অন্যান্য সমস্যা চিহ্নিত করা, (২) দ্বন্দ্ব নিরসনে সমাধান খুঁজে পাওয়া (৩) যেসকল আইন জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন খাতের নীতিমালার আলোকে সংশোধন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা প্রয়োজন তার একটি অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকা তৈরি করা এবং (৪) উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য একটি সার্বিক আইনের প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখা।

খ. বর্তমানে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ আরো বিস্তৃত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করা।